দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MA...
পৃষ্ঠা

৪

1 MAR 1987

১৭ই ফাল্গুন ১৩৯৪

বিদ্যালয়ের শাস্তি

।। নাঈমুল ইসলাম খান ।।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক নির্যাতনের পক্ষে একজন শিক্ষকও রায় না দিলেও দেশের বিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত অশোভনীয় নির্মম শারীরিক ও মানসিকভাবে অনভিপ্রেত শাস্তিদান প্রথা বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নুরুন্নাহার ফয়জুননেসার একটি সমীক্ষা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশের শুধু পল্লী অঞ্চলে নয়, বরং জেলা এমনকি রাজধানীতে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অত্যন্ত কঠোর শাস্তি বহুলভাবে প্রচলিত আছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে, শিক্ষার্থীদের শারীরিক কোন আঘাত শিক্ষকেরা দিতে পারবেন না। সে অধিকার একমাত্র প্রধান শিক্ষককে দেয়া হয়েছে। তিনিও যখন-তখন ধরে মারতে পারবেন না।

সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয় যে, ভ্রান্ত ও শারীরিক নির্যাতন শারীরিক বৈকল্য থেকে শুরু করে পড়াশুনার প্রতি অনীহা ও উৎসাহহীনতার সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক শাস্তি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা মারাত্মক মানসিক বিপর্যয় ও শিক্ষার্থীর অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

মেধার অবমূল্যায়নের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই, এই ধরনের শাস্তির কোনটাই সুপারিশযোগ্য নয়।

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আছে তা হচ্ছেঃ (ক) শারীরিক নির্যাতন, (খ) মানসিক নির্যাতন এবং (গ) মেধার অবমূল্যায়নজনিত শাস্তি। [illegible]

বর্তমানেও বিচিত্র ও অনভিপ্রেত শাস্তিগুলোর মধ্যে আছে ধমক দেয়া, মন্দ কথা বলা, দোষারোপ করা, গাল দেয়া, অপ্রীতিকর নামকরণ করা, ভীতি প্রদর্শন করা, সূর্যমুখী— সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা, সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা, জুতা-পেটা করা, মারের ফলে রক্তপাত, বেত মারা, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রের হাতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের কান মলা, চিৎ করে শুইয়ে কপালে থান ইট রাখা, নীল ডাউন, এক পা তুলে পুরো এক পিরিয়ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকা, ডাস্টার দিয়ে মাথা ফাটান, টেবিলের নিচে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, দুই হাতের তালুতে থান ইট নিয়ে এক পায়ে দাঁড়ানো— পা মাটিতে পড়লে পিটুনী, ঠেংগী অর্থাৎ মাথা নিচু করে করে দু পায়ের ভেতর নিয়ে পেছন দিক থেকে দু কান ধরা, কান ধরে উঠবস করানো, ক্লাসের সকল ছাত্র দিয়ে একটি ছেলের কান মলান, বেঞ্চের নিচে কান ধরে নুইয়ে রাখা, পেটের চামড়া ধরে চিমটি কাটা, লাইব্রেরীতে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখা, মাথার উপর ভর করে দু পা উপরে তুলে অবস্থান, চিকন চুঁচালো বাঁশের কাঠি কানের নরম অংশে জোরে চেপে ধরা, মেঝেতে/টেবিলে/বেঞ্চে নাকে খত দেয়া ইত্যাদি।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সবচেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হয় শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে। শ্রেণীতে পড়া দিতে না পারায় বা বুঝতে না পারার কারণে এবং [illegible] শিক্ষকরা শাস্তি দিয়ে [illegible]

কিন্তু অনভিপ্রেত শাস্তিদানের ফলে বহু ছাত্র নিপীড়িত বোধ করে এবং শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে, শিক্ষককে পাল্টা ভয় দেখায়, অসুস্থ হয়ে যায় আর অভিভাবকদের প্রচুর হয়রানি ভোগ করতে হয়। এভাবে শাস্তির অপপ্রয়োগের কারণে ছাত্রের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হচ্ছে। শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে এবং সমাজের বিরাট অপচয় হচ্ছে।

সমীক্ষায়, ছাত্রকে শিক্ষকের পাশে বা সামনে বসান সম্বন্ধে 'বেশী কার্যকর' মতামত পোষণ করেন শতকরা ৩৩ জন শিক্ষক ও 'মোটামুটি কার্যকর' বলেন শতকরা ৬৭ জন। একটি ত্রুটি শুদ্ধ করে একই উক্তি ১০০ বার লেখানোর পক্ষে মোটামুটি কার্যকর বলে রায় দিয়েছেন শতকরা ৮৫ জন শিক্ষক। শ্রেণীতে বসার জায়গা পরিবর্তন করে দেয়া মোটামুটি কার্যকর বলেন, শতকরা ৬৭ জন এবং শতকরা ৫৮ শিক্ষক শ্রেণীর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা ও দশ পাতা হাতের লেখা উভয় শাস্তি সম্পর্কে কার্যকর বলে রায় দিয়েছেন।

শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে কঠোর শাস্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন শতকরা ৫৪ জন শিক্ষক। শতকরা ৩৩ থেকে শতকরা ৬৫ জন শিক্ষকের রায়ে প্রত্যহ স্কুলে দেরী করে পৌঁছলে, মারামারি করলে, অন্যের জিনিস নিয়ে নিলে কঠোর শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। মাঝে মাঝে পড়া না শিখলে, স্কুলে দেরী করে আসলে, ঝগড়া করলে, শ্রেণীকক্ষে দুষ্টামি করলে, বই না আনলে, শ্রেণীকক্ষ নোংরা করলে হালকা ধরনের শাস্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন শতকরা ৭৯ জন শিক্ষক।

বাড়ীর কাজ ঠিকমত না করলে মূল্যায়নজনিত শাস্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন শতকরা ৬২ জন শিক্ষক। রোজ পড়া না শিখলে ও শ্রেণীর কাজ না করলে মূল্যায়নজনিত শাস্তির পক্ষে বলেছেন শতকরা ৫৪ জন শিক্ষক। রোজ দেরী করে এলে শতকরা ৩১ ও খাতা-কলম না আনলে, শতকরা ২৩.০৭ জন শিক্ষক মূল্যায়নজনিত শাস্তি দেয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। শতকরা ৩১ জন শিক্ষক অন্যের খাতা দেখে লিখলে মূল্যায়নজনিত শাস্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষার্থীর অপরাধের জন্য অভিভাবক, পরিবেশ, পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও কম দায়ী নয়। তাই প্রকৃত সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীকে অনুধাবন করে তাকে অনুশীলনে ব্রতী করাতে হবে।

সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মান উন্নত করতে হবে, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতির জন্য চাকুরীপূর্ব ও চাকুরীকালীন সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেই হয় তবে কোন শাস্তি ছাত্রদের সংশোধনের জন্য প্রকৃত সহায়ক তা বিচক্ষণতার সাথে বেছে নিতে হবে।

মানসিক নিপীড়নমূলক শাস্তিদান অবিলম্বে পরিহার করতে হবে।